Jagannath University Journal of Social Sciences
Vol. 13. Issue 1, 2024-2025, https://doi.org/10.3329/jnujss.v13i186087

রবীন্দ্রনাথের গ্রাম উন্নয়ন ভাবনা : বাংলাদেশের আলোকে একটি পর্যালোচনা

Md. Abul Hossen*
Professor, Department of Social Work
Jagannath University, Dhaka-1100

Abstract

An important part of Tagore's writings covers the rural development especially farmers and agriculture. Tagore has clearly depicted the reality of rural Bengal, livelihood of marginalized people, their struggle for survival in his songs, poems, stories, essays and letters. Tagore realized that the rural people did not have the power; and nor the capacity to overcome the challenges they confront in their everyday lives. In order to change the fate of rural masses Tagore laid the foundation of his initiative to rural development through an integrated and comprehensive approach based on principle of co-operation, knowledge and education. As a means of social development, he advocated for educating the poor people in the villages and strongly protested against all forms of social discrimination, untouchability, bigotry including religious bigotry. This article is based on secondary literature. In order to write this article, we have reviewed different books, journals, newspaper articles and government documents. While analyze the content we tried to focus on three themes I.e., a) Tagore's idea of agriculture, b) His cooperative thinking, and c) his idea of development and reconstruction. The findings affirmed that the idea that Tagore conceived, initiated, promoted and implemented in his lifetime for the betterment of rural community are still relevant and Policy makers, development practitioners can gain intuitive knowledge to implement those ideas and thoughts in its effort to rural development particularly in the areas of education, cooperative, health, and environmental consciousness.

Keywords: *rural community, development, microcredit, cooperative, collage industries, awareness*

১. ভূমিকা

উন্নয়ন একটি ধ্রুপদি শব্দ। সহজ করে বললে কোনো জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি প্রত্যাশিত জীবনমানের নিশ্চয়তাই উন্নয়ন। অর্থাৎ উন্নয়ন একটি অনুকূল পরিবেশের নির্দেশনা যার অর্থ হলো জনগণের জন্য আর্থ-সামাজিক অনুকূল প্রেক্ষিত তৈরি করা। রবীন্দ্রনাথের দর্শন অনুযায়ী উন্নয়ন হলো প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ভিত্তিক প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার বোধ-সঞ্জাত মানব মুক্তি ও স্বাধীনতা মধ্যস্থতাকারী একটি প্রক্রিয়া। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ব্যক্তিগত পর্যায়ের পাশাপাশি সামাজিক স্তরে মুক্তি ব্যতিত মানুষের সক্ষমতার বিকাশ সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনায় বড় একটি জায়গা জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন বিশেষ করে কৃষক ও কৃষি প্রসংগ। রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ এবং চিঠিতে ছড়িয়ে আছে কৃষক ও কৃষি প্রসঙ্গে নানা কথা।

* **Corresponding Author:** Dr. Md. Abul Hossen, Email: ahossen2001@yahoo.com
Submission: 17.11.2024; Acceptance: 04.09.2025

প্রজাবাৎসল্য, কাব্যসাধনা ছাড়াও কবিগুরুর সমবায় চিন্তা কিংবা ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা, চাষ পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত উন্নয়ন সাধনার নিদর্শন হয়ে রবীন্দ্র স্মৃতিকে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে আজও। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন, সমাজচিন্তা, সমকাল-ভাবনা, স্বদেশ-অন্বেষা সবকিছু আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি ছিলেন একাধারে একজন সংগীতজ্ঞ, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, দার্শনিক, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক। কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে নিজ মতামত প্রকাশ করেছেন। গ্রামবাংলার বাস্তবতা, প্রান্তিক মানুষ, কৃষি ব্যবস্থা, সমবায় চিন্তা, গ্রাম উন্নয়ন, কৃষক মুক্তির উপায়, শিক্ষা চিন্তা, প্রগতিশীলতা সব বিষয়ে নিজস্ব অবস্থান ও যুক্তি তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন চিন্তায় এবং কর্মসূচিতে কৃষিকর্মের আধুনিকায়ন যে গুরুত্ব পেয়েছে তার পেছনে ছিল অতীতে গ্রামের অর্থনীতিতে কৃষির প্রাধান্য এবং কৃষি কাজের ব্যবহারে সেচ ব্যবস্থার জন্য গ্রামের মানুষের যৌথ প্রচেষ্টা। ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে গৃহীত কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি ও সেচ কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানালেও জনগণের সম্পৃক্ততা না থাকার কারণে এ উদ্যোগের সফলতা নিয়ে তাঁর মনে সংশয় ছিল। সেজন্য সরকারের কর্মসূচির প্রতি নির্ভর না করে তিনি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কৃষির আধুনিকায়ন ও সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে মনোযোগ দেন। কৃষির উন্নতির জন্য সম্প্রসারণ সেবা ও সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে ঔপনিবেশিক সরকারের সদিচ্ছা ও উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর প্রশ্ন ছিল না, কিন্তু এর প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। তিনি সমবায়ভিত্তিক কৃষি উন্নয়ন এবং সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। একইসঙ্গে কেবল কৃষিতে উৎপাদন করেই যে গ্রামের কৃষকের সারা বছরে প্রয়োজন মেটানো যাবে না এবং যারা ভূমিহীন অথবা স্বল্প ভূমির মালিক তাদের জীবনধারণ সম্ভব না সে বাস্তবতা উপলব্ধি করে তিনি অকৃষি খাতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের কথা ভেবেছেন এবং গ্রহণও করেছেন। কুটিরশিল্প তাঁর গ্রামোন্নয়ন চিন্তা ও কর্মসূচিতে গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে (হাই, ২০১২)।

গ্রামের মানুষের দুর্দশার জন্য কৃষি উৎপাদনের অপ্রতুলতাকে প্রধান কারণ মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অন্য সব কারণের মধ্যে এর জন্য তিনি কৃষকের ঋণগ্রস্ততা এবং ঋণ প্রাপ্তির সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন। এ সমস্যার সমাধানে তাঁকে কৃষি ব্যাংক স্থাপনের কথা ভাবতে হয়েছে। গ্রামোন্নয়নে ঋণের সহজ লভ্যতার জন্য কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং পরে তাকে সমবায়ী রূপ দেওয়া রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ এক দিক। ক্ষুদ্রঋণ জোগান দিয়ে দরিদ্রদের সহায়তায় উদ্যোগী হয়েছেন। বাংলাদেশ এখন ক্ষুদ্রঋণের সূতিকাগার হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, রবীন্দ্রনাথ নিজে যদি তা দেখতেন তাহলে নিশ্চয়ই আনন্দিত ও উৎসাহিত হতেন। সমাজ উন্নয়নের উপায় হিসেবে তিনি গ্রামোন্নয়ন ও গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। এর পাশাপাশি সামাজিক ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধেও তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের এ প্রাণপুরুষ সমাজকল্যাণমূলক কাজেও রেখেছেন বিশেষ ভূমিকা। শিক্ষাবিস্তার, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নসহ তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজগুলোও এক অনুস্মরণীয়দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম অংশে রবীন্দ্রনাথের সমাজ, পরিবেশ চেতনা,গণমানুষের জীবনধারার মান উন্নয়নে কৃষি ও সামগ্রিক সামাজিক অবকাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ কত গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন তাঁর ভাবনার বিশদ আলোচনা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে আমরা কোন দৃষ্টিতেদেখছি, গ্রহণ করেছি আমরা কোন প্রেক্ষিতে, বিশেষ করে আমাদের শিক্ষা, সমবায়, স্বাস্থ্য, পরিবেশ চৈতন্যের কোনখানে আজ রবীন্দ্রনাথের অবস্থান– ইত্যাকার বিষয়গুলো আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রামীণ উন্নয়ন দর্শনের স্বরূপ যেমন সমতাভিত্তিক, অন্তর্ভূক্তিমূলক, আত্মনির্ভরশীল ও দেশজ উন্নয়ন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি অন্বেষণ করা;

২. শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণ ও বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন কার্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের ধারণাগুলোর প্রযোজ্যতা মূল্যায়ন করা;

৩. রবীন্দ্র উন্নয়ন দর্শনের বাস্তবায়নকল্পে চলমান উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় কি ধরনের পরিবর্তন, সুনির্দিষ্টভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন সে সম্পর্কে জানা।

৩. গবেষণা প্রশ্নসমূহ

১. রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যকর্মে গ্রামীণ বাংলার চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতাকে কীভাবে উপস্থাপন করেছেন?
২. গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প ও সমাজ সচেতনতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কৌশলের বিশেষ দিক সমূহ কি ছিল?
৩. গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য রবীন্দ্রনাথ কীভাবে সমবায়ী মডেল ও ক্ষুদ্র ঋণ কৌশলে প্রচার করেছিলেন?
৪. তিনি গ্রামীণ পুনর্গঠনকে কীভাবে একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রয়োগ করেছিলেন?
৫. বর্তমান উন্নয়ন নীতি, চর্চা ও প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ অনুসৃত নীতিমালার প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু?

৪. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি গুণগত (qualitative) পদ্ধতি অনুসরণ এবং দ্বৈতায়িক তথ্য বিশ্লেষণ -এর উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। উক্ত গবেষণায় প্রাসঙ্গিক সাহিত্যসমূহের ডকুমেন্টারি রিভিউ বা নথিপত্র পর্যালোচনা বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল রচনাবলি, বিভিন্ন বই ও জার্ণালে প্রকাশিত নিবন্ধ এবং সরকারী ও নীতিগত দলিল সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। তথ্যসমূহকে তিনটি প্রধান থিমে শ্রেণিবদ্ধ করতে থিমেটিক বিশ্লেষণ (thematic analysis) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে: ক) রবীন্দ্রনাথের কৃষি ও সমবায়ী ভাবনা খ) তাঁর শিক্ষা, সমাজ সচেতনতা বিষয়ক চিন্তা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক ধারনা গ) উন্নয়ন ও পুনর্গঠন বিষয়ে তাঁর অভিমত ও অনুশীলন। এই গবেষণায় ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ (interpretive analysis) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রামীণ উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৫. গবেষণা শূণ্যতা

বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম ও দার্শনিক অবদান নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে, তবে তাঁর গ্রামীণ উন্নয়ন উদ্যোগ, বিশেষ করে কৃষি, সমবায় আন্দোলন এবং গ্রামীণ পুনর্গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যবহারিক প্রচেষ্টাগুলোর উপর নির্দিষ্টভাবে তুলনামূলকভাবে কম গবেষণা ও চর্চা হয়েছে। বিদ্যমান গবেষণাগুলোতে প্রায়শই রবীন্দ্রনাথ অনুসৃত গ্রামীণ উন্নয়ন উদ্যোগসমূহ বর্তমান নীতি প্রণয়নে কতটা প্রাসঙ্গিক তা উপেক্ষিত থেকে গেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দনাথের উন্নয়ন, উদযুগ সমূহের লেখাগুলোর একটি থিমেটিক পর্যালোচনার আলোকে রবীন্দ্রনাথের উন্নয়ন দর্শন অন্বেষণ করবে এবং বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর প্রায়োগিক দিক পর্যালোচনা পূর্বক চলমান গবেষণা শূণ্যতা পূরণে সহায়তা করবে।

৬. পল্লীকে জানা – মানুষকে চেনা

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে জমিদারির দায়িত্ব পালনকালে সেখানকার নদ-নদী ও প্রকৃতিকে যেমন নিকট থেকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, একইসঙ্গে সেখানকার গ্রামীণ জনপদ ও সাধারণ মানুষের জীবন অবলোকনেরও সুযোগ পেয়েছেন, এ অবলোকন গভীর পর্যবেক্ষণে পরিণত হতে সময় নেয়নি। অন্য জমিদারদের মতো কেবল জমিদারির কুঠিবাড়িতে অথবা সেরেস্তায় বসে তিনি প্রজাদের সাক্ষাৎ দেননি বা তাদের কথা শোনেননি; তিনি গ্রামে তাদের কাছে গিয়েছেন নৌকা করে অথবা পালকিতে চড়ে। এতে তাঁর এবং প্রজাদের মধ্যে দূরত্বকমে গিয়েছে। প্রজারা নির্ভয়ে, নিঃশংকচিত্তে তাদের দুঃখের এবং অভাবের কথা বলেছে (চৌধুরী, ২০১৫)। তাঁর ভাষায়,

> *"আমার জীবনের অনেক দিন নগরের বাইরে পল্লী গ্রামের সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে.... যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকদের অভাব অভিযোগ এবং কতবড়ো অভাগা যে তারা, তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল। ... আমার প্রজারা বিনা বাধায় আমার কাছে এসে তাদের অভাব-অভিযোগ জানাত, কোনো সংকোচ বা ভয় তারা করত না, আমি সে সময়ে প্রজাদের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করতে চেষ্টা করেছিলাম"* (রহমান, ২০০৭:৩৩)।

অনেক পরে যখন তিনি শিলাইদহতো (১৮৮৮-১৯২২) বটেই পতিসরও (১৮৯১-১৯৩৭) ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে গিয়ে শ্রীনিকেতন (১৯২২) গড়ে তুলছেন তখন পূর্ববংগে জমিদারি দেখা-শোনার সময়কার অনুভূতির স্মৃতিচারণায়

বলেছেন : "যতদিন পল্লীগ্রামে ছিলুম ততদিন তাকে তন্ন তন্ন করে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল।..... ক্রমে এই পল্লীর দুঃখ দৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্যে কিছু করব এই আকাঙ্খায় আমার মন ছটফট করে উঠেছিল। তখন আমি যে জমিদারি-ব্যবসা করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিকবৃত্তি করে দিন কাটাই এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল" (শাকুর, ২০০৬)। এভাবেই কবি তখনকার মানুষের দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনাকে নিজের করে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে পদ্মাপাড়ের কৃষকদের দুঃখ-কষ্ট কবিকে খুব কষ্ট দিত-তিনি তাদের কষ্টের ভাগীদার হওয়ার বাসনা পুষেছিলেন। অতিবৃষ্টিতেদ্রুত নদীর জল বেড়ে ওঠায় কাঁচা ধানের জন্য কৃষকদের খুব দুঃখ-দুর্দশায় পড়তে হতো। রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেতেন, চাষিরা কাঁচা ধান কেটে নৌকো বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে। এই যে নৌকো বোঝাই করে কৃষকরা তাদের কাঁচা ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে তিনি যেন কৃষকদের বুকের ভেতরের হাহাকার শুনতে পেতেন। কবি অনুভব করতেন আর কটা দিন ধানগুলো মাঠে থাকতে পারলেই পেকে যেত কিন্তু আগাম বর্ষা, কিংবা নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ার কষ্ট কৃষকের চেয়ে কবিকেও কম কষ্ট দিত না। কৃষকের কষ্টের সমভাগীদার হতে কবি নিজেই ঘোষণা দিয়ে বলেন, নৈতিক দুঃখ এক আর পাকা ধান ডুবে যাওয়ার দুঃখ আর এক (রেজা, ২০১৫)।

শিয়ালদহ এবং পতিসর– জমিদারির এ দুই এলাকায় যখন রবীন্দ্রনাথের বসবাস এবং নৌকা নিয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে ঘোরাঘুরি করতেন, সে সময় তিনি লিখেছিলেন, বড়-দুঃখ, বড় ব্যথা-সমুখেতে কষ্টের সংসার বড় দারিদ্র্য, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বন্ধ অন্ধকার/অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু/চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু/সাহস বিস্তৃত বৃক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে কবি/একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি। একই সময়ে তিনি ব্যক্ত করেন তাঁর সংকল্পঃ এইসব মূঢ় স্লান মূক মুখে/দিতে হবে ভাষা, এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে/ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা (ঠাকুর, ২০১১)। এ অনুভব তাঁকে কখনো নিয়ে গেছে দরিদ্র প্রজাকূলের জীবন-সংগ্রামের ভেতর, কখনো এ বাংলার কৃষকদের ভাল-মন্দের ভাবনায়, কখনো গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিন্তায়, কখনো প্রান্তিক মানুষকে সংগঠিত হয়ে পথ চলার ভাবনায়।

৭. দর্শন আত্মশক্তিঃ সমবায়িক প্রেরণা

আজ আমরা সবাই দারিদ্র ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ সন্ধান করছি। কিন্তু প্রায় একশো সাত বছর আগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমবায় নীতি-১ প্রবন্ধে বলেছিলেন দারিদ্র্যের ভয় আসলে ভূতের ভয়। ছাড়া ছাড়া থাকার জন্যই মানুষের এ ভয়। একত্রিত হতে পারলে, ভরসার পরিবেশ তৈরি করতে পারলে এ ভয় কাটিয়ে উঠা খুব মুশকিল হবে না বলে তিনি মনে করতেন (রহমান, ২০০৭)। তিনি বরাররই মনে করতেন যার অভাব আছে তার অভাবমোচনের শক্তিকে জাগিয়ে তোলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আত্মশক্তি জাগরণের এপ্রচেষ্টা ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। পূর্ব-বাংলার কৃষকদের দুঃখ দেখে তিনি তাদের সমবায় গঠন করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রায় ১০০ বছর পূর্বে সমবায়ের মাধ্যমে আধুনিক যান্ত্রিক চাষপদ্ধতির মাধ্যমে জমিতে ট্রাক্টর ব্যবহারের মাধ্যমে টুকরো জমির আল উঠিয়ে একত্রে ফসল ফলানো, উৎপাদিত ফসল সমবায় গোলায় রাখা এবং পণ্য বিপণনের সুযোগ্য ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।[৮] তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, গ্রামের মানুষ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অর্থনৈতিক চাপের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে, সম্পদ ক্ষুদ্র হয়ে আসছে। সমাজের ক্ষুদ্র একটি শ্রেণি ধনী হয়ে পড়ছে এবং অধিকাংশ নির্ধন হচ্ছে। এদের মধ্যে একটা শ্রেণি মধ্যস্বত্বভোগী। তিনি ধনী-নিধন, বিত্তবান-কৃষক ও বিত্তহীন-কৃষককে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমবায়ী করে তোলেন ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তিনি সমগ্র এলাকাকে কয়েকটি মণ্ডলে বিভক্ত করেন।

তিনি বরাবরই আত্মশাসনের পক্ষে ছিলেন। গ্রামোন্নয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে প্রথমেই স্থান পেয়েছিল আত্মসচেতনতা ও জীবনসঞ্চার–যার ভিত্তিতে গ্রামের মানুষ নিজের শক্তিতে স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করবে। যার অভাব আছে তার অভাব মোচনের শক্তিকে জাগিয়ে তোলা দরকার বলে মনে করতেন তিনি। এভাবে দুটি-তিনটি গ্রামকে অজ্ঞতা ও অক্ষমতার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে ভারতের জন্যে ছোট একটা আদর্শ তৈরি করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর (রহমান, ২০০৯)। পল্লীর উন্নতির জন্য তাঁর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল। "আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের যেখানে হোক

একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্‌বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট, তার ঘরবাড়ি পরিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চা ও আমোদ-প্রমোদ, তার রোগীপরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদ, নিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা করি" (খান, ২০১৯)। একটা শ্রেণি চেতনাও এ সময় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। চাষীদের অর্জিত অর্থ জমিদারের ঘরে জমা হয় আর সে অর্থ ব্যয় করে পুত্র-জামাতাকে আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন। তাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন:

> *"তোমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার অন্ন-গ্রাসের অংশ নিয়ে বিদেশে কৃষি শিখতে গেছ– ফিরে এসে এই হতভাগ্যদের অন্ন-গ্রাস কিছু পরিমাণেও যদি বাড়িয়ে দিতে পার তা হলেই ক্ষতিপূরণ হলে মনে সান্ত্বনা পাব। মনে রেখো জমিদারের টাকা চাষির টাকা এবং এই চাষিরাই তোমাদের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেরা আধপেটা খেয়ে এবং না খেয়ে বহন করছে। এদের এই ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করবার দায় তোমাদের উপর রইল নিজেদের সাংসারিক উন্নতির চেয়েও এইটেই তোমাদের প্রথম কর্তব্য হবে"* (হাই, ২০১২:২০)।

তিনি ওপর থেকে গ্রামের মানুষের ওপর কিছু চাপিয়ে দেননি, অথবা বাইরের আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে তাদেরকে উন্নতিসাধনের আশ্বাস দেননি। তাঁর গ্রামোন্নয়নের দর্শন, চিন্তা-ভাবনা ও গৃহীত কৌশলের পেছনে ছিল গ্রামীণ মানুষের আত্মশক্তির বিকাশ এবং স্বনির্ভরতার পথে অগ্রসর হয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। তিনি অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কখনো কখনো প্রত্যক্ষভাবে গ্রামোন্নয়নের কাজে অংশ নিয়েছেন কিন্তু কখনই গ্রামের মানুষকে আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্য বিস্মৃত হতে দেননি (দত্ত, ১৯৮৮)। আর সে কারণেই দারিদ্র্য নিরসনে তিনি গরিবকে দান-ভিক্ষে দেবার পক্ষে ছিলেন না। তাদের তাতে আত্মসম্মান নষ্ট হবার আশংকা থাকে। তিনি বরং তাদের আরও উদ্যোগী হবার এবং আত্মপ্রত্যয়ী হবার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, সাধারণের-দারিদ্য হরণের শক্তি ধনীর ধনে নেই। সে আছে সাধারণের শক্তির মধ্যেই। এই কথাটা জানা চাই, এবং তার দৃষ্টান্ত সকলের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া চাই। জনসাধারণ যদি নিজের অর্জনশক্তিকে একত্র মেলাবার উদ্যোগ করে তবে এই কথাটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে যে, যে মূলধনের মূল সকলের মধ্যে তার মূল্য ব্যক্তি-বিশেষের মূলধনের চেয়ে অসীমগুণে বেশি (খান, ২০১৯)। তিনি মনে করতেন, মানুষ সংগঠিত হলে উন্নয়ন সহজ হয়। আর সে কারণেই তার গ্রামীণ উন্নযন কর্মসূচির দুটো দিক ছিল: (১) স্ব-উন্নয়ন; (২) সচেতনায়ন। দ্বিতীয় দিকটি তার কাছে বেশি গুরুত্ব বহন করত। মানুষের যদি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতার কারণে মনের শক্তি হারিয়ে যায়, তাহলে তার পক্ষে কোনো উদ্যোগেই অংশ নেওয়া সম্ভব নয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রাথমিক বোধও যদি তাদের অন্তরে জায়গা করে নিতে না পারে, তাহলে ইহজাগতিক জীবন চলার পথ তারা কী করে খুঁজে পাবেন! তিনি মনে করতেন, অজ্ঞানতার চেয়ে বড় কোনো দুর্ভাগ্য থাকতে পারে না। আর সেই অজ্ঞানতাকেই যদি মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন, মানুষ হিসেবে সেটিও তার জন্য বড় পাপ। আর এ পাপ থেকে মুক্তির জন্য মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। সে জন্যই তার উপলব্ধি হয়েছে, ঐক্যবোধের দ্বারাই সকল প্রকার ঐশ্বর্যের সৃষ্টি হয় (করিম, ২০১১)।

রবীন্দ্রনাথ পল্লী উন্নয়ন বলতে পল্লীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়নকেই বুঝেছিলেন, শুধু উৎপাদনের জন্য উন্নয়নকে বোঝাননি (করিম, ২০১১)। তিনি পল্লী উন্নয়নকে পল্লীর মানুষের আহার, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধান স্বরূপ যেমন বুঝেছিলেন, তেমনি তাকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধির উপায় বলেও অনুধাবন করেছিলেন।[১৬] তাঁর গ্রামোন্নয়ন ভাবনাটি ছিল সামগ্রীক উন্নয়ন ভাবনার অংশ। এ প্রসঙ্গে বলা যায়,

> *''আজ চূড়ান্ত বিচারে মানব উন্নয়ন মানে মানুষের উন্নয়ন, মানুষের জন্য উন্নয়ন এবং মানুষের দ্বারা উন্নয়ন। 'মানুষের উন্নয়ন' বলতে বুঝায় মানব সম্পদ উন্নয়ন, মানব সক্ষমতার বৃদ্ধি ও প্রসার। উন্নয়নের সুফল প্রত্যেক মানুষের জীবনে পৌঁছে দেয়ার অন্য নাম মানুষের জন্য উন্নয়ন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে শুরু করে সব রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুফল সমাজের প্রতিটি মানুষ যেন ভোগ করতে পারে। মানুষের দ্বারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে বোঝায়। এ অংশগ্রহণ শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যেসব দিক মানুষের জীবনকে*

প্রভাবিত করে, সে সব দিক নিয়ন্ত্রণ নয় বরং সে দিকগুলোকে প্রয়োজনবোধে প্রভাবিত করার সুযোগ প্রতিটি মানুষের থাকে। তাহলে সে মাত্রিকতাই মানুষের দ্বারা উন্নয়ন বলে অভিহিত করা হয়" (দত্ত, ১৯৮৮:৫)।

৮. পল্লী-নগর মেলবন্ধন–পরিবেশ সুরক্ষার শিক্ষা অন্বেষণ

দীর্ঘদিন গ্রামের মানুষের সঙ্গে কাজ করতে করতেই রবীন্দ্রনাথের গ্রামীণ উন্নয়ন ভাবনাসমূহ পোক্ত হয়। নিজের চোখে দেখেছেন বলেই গ্রামের প্রতি যে অন্যায্য আচরণ করা হচ্ছিল তা তিনি তাঁর লেখায় স্পষ্ট করে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। পল্লীর প্রতি এ অবহেলা শেষ পর্যন্ত যে আমাদের নগরকেও ভালভাবে টিকতে দেবে না সে কথা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাঁর ভাষায়, "আজ পল্লী আমাদের আধমরা, যদি এমন কল্পনা করে আশ্বাস পাই যে, অন্তত আমরা আছি পুরো বেঁচে, তবে ভুল হবে, কেননা মুমূর্ষুর সঙ্গে সজীবের সহযোগ মৃত্যুর দিকেই টানে" (ঠাকুর, ২০১১)। তিনি এও বলেছেন যে, "গ্রামে অন্ন উৎপাদন করে বহু লোকে, শহরে অর্থ উৎপাদন ও ভোগ করে অল্পসংখ্যক মানুষ, অবস্থার এ কৃত্রিমতায় অন্ন এবং ধনের পথে মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটেছে। ওই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সভ্যতা বাসা বাঁধে তার বাসা বেশি দিন টিকতেই পারে না। গ্রীসের সভ্যতা নগরে সংহত হয়ে আকস্মিক ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে বিস্মিত করেছিল, কিন্তু নগরে একান্ত কেন্দ্রীভূত তার শক্তি স্বল্পায়ু হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে" (ঠাকুর, ২০১২)।

এ অবস্থার অবসানের জন্যেই তিনি সারা পৃথিবীর আলো পল্লীতে ফেলতে বলেছেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরশ পল্লীবাসীরও পাবার অধিকার রয়েছে। সে কারণে নগরবাসীরও রয়েছে দায়। দেশে জন্মালেই যে দেশ আপন হয় না সে কথা তিনি তাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। "যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়" (হাই, ২০১২)। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার বিরাট একটা অংশ জুড়ে ছিল পরিবেশ-সচেতনতা। তিনি আক্ষরিক অর্থে বিজ্ঞানী না হয়েও প্রায় শতবর্ষ আগে, বৃক্ষের অবদান যে অপরিসীম, এ দূরদৃষ্টি পোষণ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বৃক্ষ না থাকলে জীবন বাঁচবে না। পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হবে। জীবের আহার জুটবে না। জীবজগত পাবে না নির্মল বায়ু। তিনি প্রায় পঁচাশি বছর আগে বাংলা ১৩৩৩ সালে 'বৃক্ষবন্দনা' নামে কবিতা রচনা করেছিলেন। বৃক্ষবন্দনা কবিতার অংশবিশেষ:

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যেও আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ;
উর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে (খান, ২০১৯:২২)।

দূষণমুক্ত পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনায় তিনি ছিলেন তাঁর কাল থেকে বিস্ময়কর রকম অগ্রগামী। বিশ্বমানবতার এ মহান কবি যদিও পরিবেশ বলতে বিশ্বমানবের পরিবেশই বুঝতেন, তবু তাঁর স্বদেশই ছিল এর কেন্দ্রে। তাঁর বাংলাদেশে ছিল নগরবাংলা, সবুজ পত্রপল্লবে ঢাকা পাখিডাকা নদীমাতৃক বাংলাদেশ। সেজন্য রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিবস বাইশে শ্রাবণকে তাঁর আশ্রম শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ দিবস হিসেবে ধার্য করা হয়েছে।এর আগেও কবি বৃক্ষরোপণ করেছেন বেশ কয়েকবার, তবে বিদেশের মাটিতে। ১৯২৬ সালে চিকিৎসকদের পরামর্শে হাঙ্গেরির বালাতন হ্রদের তীরে এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে তিনি Lindentree'র চারা রোপণ করেন ৮ নভেম্বরে। সে বৃক্ষরোপণ উপলক্ষে কবি লেখেন:

হে তরু, এ ধরাতলে রহিব না যবে
সেদিন বসন্তের নব পল্লবে পল্লবে
তোমার মর্মরধ্বনি পথিকেরে কবে
'ভালোবেসেছিল কবি বেঁচেছিল যবে' (খান, ২০১৯:২৫)।

৯. শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই আত্মশক্তির পক্ষে ছিলেন। আর শিক্ষার মাধ্যমে এ আত্মশক্তিরউদ্বোধন করতে চাইতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন – আমাদের দুঃখের লক্ষণগুলোকে বাহির হইতে দূর করা যাইবে না, দুঃখের কারণগুলোকে ভেতর হইতে দূর

করিতে হইবে। তাহা যদি করিতে চাই তবে দুটি কাজ আছে। এক, দেশের সর্বসাধারণকে শিক্ষা দিয়া পৃথিবীর সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহাদের মনের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া-বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদের মনটা গ্রাম্য এবং একঘরে হইয়া আছে, তাহাদিগকে সর্বনামের জাতে তুলিয়া গৌরব দিতে হইবে, ভাবের দিকে তাহাদিগকে বড় মানুষ করিতে হইবে-আর-এক, জীবিকার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরস্পর মিলাইয়া পৃথিবীর সকল মানুষের সংগে তাহাদের কাজের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া (হাই, ২০১২)। প্রথমেই শিক্ষার ওপর তাঁর গুরুত্ব আরোপ ছিল, কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষালাভের মাধ্যমেই আত্মশক্তির উন্মোচন হতে পারে। তিনি এটাও মনে করতেন যে অজ্ঞানতার চেয়ে বড়ো পাপ আর কিছু নেই। শিক্ষাদানের মাধ্যমেই পল্লীকে আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে তোলার স্বপ্ন ছিল তাঁর। তিনি বলেছেন, নিজের পাঠশালা, শিল্প-শিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাংক স্থাপনের জন্যে পল্লীবাসীদের শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে। এমনি করে দেশের পল্লীগুলো আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাব (রহমান, ১৯৯৯)। এর পরপরই তিনি লিখেছেন, আমাদের দেশে সকলের চেয়ে দরকার হাতে ভিক্ষা তুলিয়া দেওয়া নয়, মনে ভরসা দেওয়া। মানুষ না খাইয়া মরিবে শিক্ষার অভাবে, অবস্থার গতিকে হীন হইয়া থাকিবে, এটা কখনোই ভাগ্যের দোষ নহে, অনেক স্থানেই এটা নিজের অপরাধ। দুর্দশার হাত হইতে উদ্ধারের কোনো পথই নাই, এমন কথা মনে করাই মানুষের কর্ম নয়। মানুষের কর্ম জয় করিবার, হার মানিবার ধর্ম নয় (বাণু, ২০০৮)।

তাঁর মতে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা হলো প্রকৃতি থেকে মানুষের বিচ্ছিন্নতা। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে রয়েছে নিবিড় বন্ধনের একাত্মতা। শিক্ষাকে তিনি দেখেছেন জীবনের সাথে সমন্বিত করে। আর এ লক্ষ্যেই তিনি তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন শ্রীনিকেতনে। গ্রামের ছেলেদের জন্যে শিক্ষাসত্র, (১৯২৪) গৃহস্থদের জন্যে লোকশিক্ষা সংসদ (১৯৩৬) এবং গ্রামের স্কুল শিক্ষকদের জন্যে শিক্ষাচর্চা ভবন (১৯৩৭)। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের ধরন থেকে এদের ব্যবস্থা ছিল অনেকটাই ভিন্ন। শান্তিনিকেতনের পড়াশোনা দেশের শিক্ষাক্রমের ও তার বিষয় বিভাজনের মূল ধারার অন্তর্গত ছিল। এসব শিক্ষায়তনে তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি, মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ অর্থনীতিতে ও জীবনযাপনে যার যা কাজ তাতেই যেন সে নিয়োজিত থেকে ভালোভাবে বাঁচে। তাকে যেন জমি থেকে, গ্রামের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে না হয়। পড়তে এসে পাসের ভয়ে যেন তারা কুঁকড়ে না পড়ে (হাই, ২০১২)। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে শিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর শিক্ষা ভাবনায় ভারতের তপোবনের ঐতিহ্য এবং ইউরোপের আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বলা যায়,'The poet with the head of a thinker। কবিকে এ অভিধাটি দিয়েছিলেন সাংবাদিক ডিমিট্রি ম্যারিয়ানক, যিনি ১৯৩০ সালের ১০ আগষ্ট, নিউ ইয়র্ক টাইমস' এ প্রকাশিত আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যেকার সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন (জামান, ২০১৩)। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে নিজস্ব সংস্কৃতির পাটাতনে স্থাপন করার পক্ষে মত দিয়েছেন। শেকড় বিচ্ছিন্ন আরোপিত শিক্ষা ব্যবস্থার ভয়াবহতা সম্বন্ধে তার মন্তব্য এখানে তুলে ধরছি।

> *''আর তা যদি একান্তই অসম্ভব বলে গণ্য করি, তবে বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিন বিলাতের আমদানী করা টবের গাছ হয়ে থাকবে, টব মূল্যবান হতে পারে, অলঙ্কৃত হতে পারে, কিন্তু গাছকে সে চিরদিন পৃথক করে রাখবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে, বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সখের জিনিস হবে, প্রাণের জিনিস হবে না''* (হাই, ২০১২:২৫)।

১০. কৃষির আধুনিকীকরণ, বহুমুখীকরণ ও কুটির শিল্প প্রসার

বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া কৃষকদের দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্র্য তাঁকে পীড়িত করেছে, আহত করেছে। তিনি কৃষকদের দুঃখ মোচনের জন্য কৃষিতে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। পশ্চাদপদ শিলাইদহের গ্রামীণ জীবনে নিয়ে এসেছিলেন যন্ত্রযুগের আধুনিকতা। জমি চাষের জন্য আনিয়েছিলেন গতিময় ট্রাক্টর। বসিয়েছিলেন ধানের কল। পারিবারিক প্রথা ভেঙ্গে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ, কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ, বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে কৃষিবিদ্যা ও গো-পালন শিখতে পাঠিয়েছিলেন আমেরিকা। আবার শুধু চাষের ওপর নির্ভরশীল হলেও যথাযথ উন্নয়ন সম্ভব হবে না। তাই তিনি কৃষকদের কুটিরশিল্পের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে চেয়েছিলেন, সেসঙ্গে কৃষি উৎপাদনকে বহুমুখী করার প্রচেষ্টাও তাঁর ছিল। শিলাইদহে কৃষি বহুমুখী করার জন্যে তিনি আলুচাষের পাশাপাশি ভুট্টা, কপি, পাটনাই মটর, আখ ইত্যাদি চাষের ব্যবস্থা করেছিলেন, এতে কৃষকরা সুফল পায়। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ আখ মাড়াইয়ের জন্যে আখমাড়াই কল

স্থাপন করেন। তিনি স্থানীয় দলি ও কাজলা জাতীয় আখের পরিবর্তে ঢাকার গেণ্ডারী আখচাষের প্রবর্তন করেন (হাই, ২০১২)।

কিন্তু এসবও যথেষ্ট হবে না উপলব্ধি করে তিনি কুটির শিল্পের প্রসারের জন্য উদ্যোগ নেন। তিনি গ্রামীণ অর্থনীতিকে কেবল কৃষি নির্ভর না করে বহুমুখী করতে চেয়েছেন। তাঁতশিল্প জনপ্রিয় করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন লক্ষমাত্রা যোগ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। বয়নশিল্পে প্রশিক্ষণের জন্য শিলাইদহ থেকে একজন তাঁতীকে নিয়ে যাওয়া হয় শ্রীরামপুরে। একজন মুসলমান তাঁতীকে পাঠানো হয় শান্তিনিকেতনে তাঁতের কাজ শিখাতে। শিলাইদহে একটা তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও খোলা হয় তাঁর উদ্যোগে। স্বল্প মূলধনভিত্তিক ছাতাশিল্প, মৃৎশিল্প, সূচিশিল্প, বাঁশ ও বেতের বিবিধ শৌখিন দ্রব্য-সামগ্রী তৈরি, মাদুর তৈরি এসব কুটির ও হস্তশিল্পের প্রসারে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। চাষীদের বেকারত্ব দূর করার জন্য পুত্র রথীন্দ্রনাথকে নির্দেশ দিলেন (রহমান, ১৯৯৯):

> *"এখানকার (পতিসর) চাষিদের কোনো ইন্ডাষ্ট্রি শেখানো যেতে পারে, সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না-এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিসটাকে Cottage industry রূপে গণ্য করা চলে কি না। একবার খবর নিয়ে দেখিস অর্থ্যাৎ ছোটখাটো Furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভব কি-না। আর একটা জিনিস আছে ছাতা তৈরী শেখানো। সে রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে"* (রহমান, ২০০৭:২০)।

১১. গ্রামীণ স্বাস্থ্য-গণস্বাস্থ্যের মূলকথা

শিক্ষা প্রসার ও কৃষিখাতের উৎপাদন বৃদ্ধির পরই রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন চিন্তায় গুরুত্ব পেয়েছে স্বাস্থ্যসেবা, যার জন্য গ্রামে ডিসপেনসারি খোলা হয়েছে দাতব্য হিসেবে অথবা সমবায় ভিত্তিতে। ১৯২৩ সালে ঔষধপত্র দেবার জন্যে শ্রীনিকেতনে একটা ডিসপেনসারি খোলা হয়। স্বাস্থ্য সমবায় কাজ শুরু করে ১৯৩২-এ, ধাত্রী সেবার ব্যবস্থাও তাতে থাকে। রোগ প্রতিরোধের জন্য পরিচ্ছন্নতা অভিযান, ময়লা নিস্কাষণ নিষ্কাশন, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক কুইনিন বিতরণ, খাল-ডোবা ইত্যাদি সংস্কার, এগুলোর ওপর জোর দেওয়া হয় শ্রীনিকেতনে। এসব কাজে স্বেচ্ছাসেবীদের ব্যবহার করা হয়, শুধু সুরুলেই (পরে শ্রীনিকেতন) তা সীমাবদ্ধ থাকে না, আশপাশের গ্রামেও তা ছড়ায় (হাই, ২০১২)। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে তাঁর পিতা মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেও হোমিও চিকিৎসার মাধ্যমে বহু রোগীর চিকিৎসা করেছেন।বায়োকেমিক চিকিৎসায়ও রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ গ্রামে গ্রামবাসীদের জন্য নিজেই ঔষধ দিতেন।

১২. বাংলাদেশ বর্তমান প্রেক্ষিত রবীন্দ্র ভাবনার পরিসর

আমরা এখন গর্ব ভরে বলি– আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ধান-পাট ছাড়া আরও অনেক ধরনের ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর লালন-পালন বেড়েছে এবং বাজারে তার প্রমাণ মেলে। দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন হচ্ছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে। বিশেষ করে গত ২০-২৫ বছরে এসব ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন লক্ষণীয়। দেশীয় অনেক জাতের মাছ হারিয়ে যাচ্ছে এবং সেজন্য আমাদের কষ্ট আছে। কিন্তু মাছের মোট উৎপাদন অনেক বেড়েছে। উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেও তরুণ প্রজন্মের একটি অংশ কৃষিকাজে যুক্ত হচ্ছে, যা উৎসাহব্যঞ্জক। এ অসম্ভবকে সম্ভব করেন আমাদের কৃষক। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাদের উৎপাদিত ফসলে আমাদের গোলাভর্তি হয়। কৃষক এখন স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনের সন্ধান পেয়েছেন। বদলে গেছে গ্রামের চিত্র। কৃষককে ৩০ হাজার কোটি টাকার কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে। ১ কোটি ৪৪ লাখ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বন্টন করা হয়েছে তাদের মধ্যে। এ যে সবুজবিপ্লব, এর পেছনেও রয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা। বিগত ১২২ বছরে বাংলাদেশের কৃষকের ভাগ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু রয়েছে। এসব তথ্য কেন্দ্র থেকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সরকারী ফরম, নোটিশ, পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত তথ্য, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন সেবা বিষয়ক তথ্য, চাকুরির খবর, নাগরিকত্ব সনদপত্র, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, বিদেশে চাকুরি প্রাপ্তির লক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশনসহ ২২০টি সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উপরন্তু মোবাইল ব্যাংকিং, জীবনবীমা, মাটি পরীক্ষা ও সারের সুপারিশ, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ এবং জমির পর্চাসহ অন্যান্য সেবা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রায় ৪ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। থানা/উপজেলা হাসপাতালগুলোতে মোবাইল স্বাস্থ্যসেবা চালু হয়েছে (বিশ্বাস, ২০১৫)।

সরকারি ব্যাংকগুলো কৃষিখাতে ঋণ বাড়াচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কৃষি ব্যাংকের ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৬ হাজার ৩০০ কোটি টাকার মধ্যে ৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকা কৃষিঋণের জন্য নির্ধারিত, যা লক্ষ্যমাত্রার ৭৬ শতাংশ। অবশিষ্ট ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ১ হাজার কোটি টাকা এসএমই ও ৫০০ কোটি টাকা কৃষিভিত্তিক শিল্প খাতের জন্য রাখা হয়েছে। কৃষককে উন্নতজাতের বীজ, সার, সেচের জন্য বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত কৃষককে পরামর্শ প্রদানের জন্য কৃষি অফিসার হাতের কাছেই মিলছে। সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন এবং সংবাদপত্র ও বেতারে কৃষি বিষয়ে মিলছে পরামর্শ। গ্রামে বিদ্যুৎ যাচ্ছে আগের তুলনায় বেশি পরিমাণে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হচ্ছে। বড় বড় শহর থেকে যে কেউ গাড়িতে গ্রামের বাড়িতে চলে যাচ্ছে অনেক কম সময়ের মধ্যে (গুপ্ত, ২০১৫)। কৃষি ব্যাংক বিধবা ভাতা, ঘরে ফেরা ভাতা, বৃদ্ধ ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, ১০ টাকায় কৃষকদের হিসাবসহ সরকারের নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। ১০ টাকার কৃষক হিসেবের সংখ্যা ২৫ লাখ ৫৩ হাজার এবং বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় কৃষি ব্যাংকের উপকারভোগীর সংখ্যা ৯ লাখ ২৫ হাজার। সঞ্চয়ী হিসাবের সংখ্যা ৭১ লাখ। ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৩৪ লাখ, যার ৯৫ শতাংশ কৃষক (রহমান, ২০১৫)।

১৩ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবাকে পৌঁছে দেয়া হয়েছে মানুষের দোর গোড়ায়। সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে সারে৪/ সাড়েচার হাজার ডিজিটাল কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। গত অর্থবছরে সাড়ে ৩ কোটি মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হয়েছে। ৬ বছরে ১৫৯ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিরতণ করা হয়েছে। ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে ১ লক্ষ ২০ হাজার শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করা হয়েছে। তবে একই সঙ্গে প্রশ্ন– কৃষিতে যতটা উন্নতি ঘটছে, সে তুলনায় কৃষকের উন্নতি ঘটছে কি? গ্রামের কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজারের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ আছে তারা এক বাক্যে রায় দেবেন যে,ফুলকপি বা বাঁধাকপি গ্রামের কৃষক প্রতিটি পাঁচ টাকায় বিক্রি করেন, সেটা ঢাকা বা চট্টগ্রামের বাজারে দুই বা তিন গুণ এমনকি পাঁচ গুণ পর্যন্ত বেশি দামে বিক্রি হয়। এভাবে কৃষক মার খাচ্ছে, ভোক্তার পকেট কাটা যাচ্ছে। মাঝখানে কিছু মধ্যস্বত্বভোগী লোকের পকেটে জমা হচ্ছে কালো টাকা। সরকারকে এ বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। উৎপাদিত ফসল দেশের নানা প্রান্তের বাজারে ছড়িয়ে দিতে অর্থাৎ বাজার বড় করতে অবশ্যই মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু কৃষকরা ক্রমাগত বাজারে বঞ্চিত যেন না থাকেন, তার সুরক্ষা দিতে হবে সরকারকেই (গুপ্ত, ২০১৫)।

১৩. পল্লী উন্নয়নে টেকসই ভাবনা: রবীন্দ্রনাথের পথে চলা

রবীন্দ্রনাথ বাংলার কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে ভাবতেন। বাংলাদেশে এখন এ বিষয়টি অগ্রাধিকার পাচ্ছে।গ্রামীণ মানুষকে মানবেতর জীবনযাপন থেকে মুক্তি দিয়ে তাদেরকে সুস্থ, সচ্ছল এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ জীবনের দিকে যাত্রার উপায় তিনি শুধু দেখিয়ে দেননি, কিংবা সে সম্পর্কে পরামর্শ বিতরণ করেননি, নিজের উদ্যোগেও কাজ করে দেখিয়েছেন আত্মশক্তি এবং স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে সমাজের দুর্বলতম অংশ সে পথে অগ্রসর হতে পারে। গ্রামীণ সমবায় স্থাপন, কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষার সুযোগ প্রদান, কুটিরশিল্পের প্রসার এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে তিনি গ্রামের হত-দরিদ্র মানুষের জীবনকে পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখাতে পেরেছিলেন। পতিসরের কৃষি ব্যাংক, শ্রী নিকেতনের সমবায়ভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন ভাবনা ও কর্মসূচি শুধু সমকালে সফল হয়নি, তা এখনো অনুকরণীয় হয়ে রয়েছে। সামাজিক সূচকে, আমরা অনেক এগিয়ে গেছি। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অমর্ত্য সেন পর্যন্ত এক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রশংসা করেছেন। কবিগুরুর সমবায় চিন্তা কিংবা ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা, চাষ পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত উন্নয়ন সাধনার নিদর্শন হয়ে রবীন্দ্র স্মৃতিকে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে আজও। রাষ্ট্রীয় এবং দেশজ ঐতিহ্য সংলগ্ন রবীন্দ্র-স্মৃতিসম্ভার ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। যত সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে, তিনি যেন তাঁর চেয়ে বিশাল হয়ে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন আমাদের নিত্যজীবনে, রাজনৈতিক দর্শনে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজির (২০১৫) যে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে কাউকে পিছনে ফেলে নয় সকলকে নিয়ে উন্নয়নের যে চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে তাও গৃহীত হয়েছে উন্নয়ন ধারণায় (বিশ্বাস, ২০১৯)। কৃষি ও পল্লীর জনজীবনের উন্নয়নের রবীন্দ্রনাথের ভাবনা আজ সভ্যতার এ বিকশিত সময়ে এসেও দারুণ উপযোগী। জীবন-জীবিকা ও অর্থনীতির প্রশ্নে তার দর্শন সত্যিই অভাবনীয়। তিনি বলেছেন, 'কোনোমতে খেয়ে পরে কি থাকতে পারে এতটুকুমাত্র ব্যবস্থা কোনো মানুষের পক্ষেই শ্রেয় নয়, তাতে তার অপমান। যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বৃত্ত অর্থ, উদ্বৃত্ত অবকাশ মনুষ্যত্ব-চর্চার পক্ষে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন।' কিন্তু বিশাল এ দিক নির্দেশনা, সৃজনশীলতার এ প্রেরণাকে আমরা কাজে লাগাতে পারছি না।

আজকের বাংলাদেশে নানা কৌণিকেই রবীন্দ্রনাথের অবদান বিবেচনার অপেক্ষা/ দাবী রাখে। অর্ধশতাব্দী সময়ব্যাপী জমিদার রবীন্দ্রনাথ পল্লী উন্নয়নের যে ধারা গড়ে তুলেছিলেন, গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপন করে গ্রামের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন– বলা যায় শুধু বাংলাদেশই নয়, বিশ্বের অনেক দেশই সেই পথকে এখন অনুসরন/অনুসরণ করে চলেছে। আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা, আমাদের কৃষি, আমাদের অর্থনীতি, আমাদের গ্রামোন্নয়ন,আমাদের সমবায়, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের সংগঠন এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশাল অবদানকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আমরা যত দ্রুত আন্তরিক হতে পারব, অনুসরণ করতে পারব তত দ্রুত আমরা খুঁজে পাব দিশাহারা প্রান্তিক মানুষের মুক্তি (সিরাজ, ২০১৩)। বাংলাদেশকে নিয়ে আমাদের এখন অনেক স্বপ্ন। বিশ্বের নানা দেশে সৃজনশীল নানা কর্মপ্রয়াসে আমাদের নাগরিকরা জড়িত রয়েছেন। আগামীতে তা আরো ব্যাপকতা লাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই। আমরা বলতে পারি, কবিগুরুর প্রত্যাশা পূরণকরার সঠিক পথেই রয়েছে বাংলাদেশ। জন্মের দেড় শতাধিক বছর পেরিয়ে গেলেও বাঙালির নিত্যদিনের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি এখনো দীপ্যমান। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমগ্র চেতনা জুড়ে। তাঁর উপস্থিতি আমাদের মনোলোকে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে তাঁকে প্রতিদিন একবার নয়, বহুবার স্মরণ করতে হয়। আমাদের প্রাণে চিন্তায়, চেতনায় মননে, রুচিতে তিনি সর্বক্ষণ উপস্থিত। আমাদের প্রাণের ভালবাসার এ কবির স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

তথ্যনির্দেশ

করিম, আনোয়ারুল (২০১১), রবীন্দ্রনাথঃ গ্রামোন্নয়ন ভাবনা, মূর্ধন্য প্রকাশনী, ঢাকা।

খান, আকবর আলি (২০১৯), দুর্ভাবনা ও ভাবনা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, প্রথমা প্রকাশনী।

গুপ্ত, অজয় দাশ (২০১৫), কৃষি ও কৃষক এবং এবার ফিরাও মোরে, ১৮ মে, সমকাল।

চৌধুরী, সাইফুদ্দীন (২০১৫), রবীন্দ্রনাথ, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু, ৬ আগষ্ট, সমকাল।

জামান, সৈয়দ আইরিন (২০১৩), একুশ শতকে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা, বিডি নিউজ পত্রিকা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১২), রবীন্দ্র সমগ্র, পাঠক সমাবেশ, খণ্ড ১৪।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১১) রবীন্দ্র সমগ্র, পাঠক সমাবেশ, খণ্ড ১ম ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১১) রবীন্দ্র সমগ্র, পাঠক সমাবেশ, খণ্ড ৪র্থ ।

দত্ত, ভবতোষ (১৯৮৮), রবীন্দ্রনাথের গ্রাম উন্নয়ন চিন্তা, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী, পৃ. ৩৫

বানু, আরজুমন্দ আরা (২০০৮), কৃষক ও কৃষি প্রসঙ্গে রবীন্দ্র ভাবনা।

বিশ্বাস, মিল্টন (২০১৯), এক দশকের উন্নয়ন: পরিপ্রেক্ষিত গ্রামীণ জনপদ, ২৯ জানুয়ারী, জনকণ্ঠ।

বিশ্বাস, মিল্টন (২০১৫), ফিরে না হলে বাংলাদেশ হতো পাকিস্তান।

মেহেরুননেছা (২০১৪), রবীন্দ্রনাথের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ভাবনা ও কার্যক্রম, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

মাযহার, মাসুদ (২০১৭), রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর উপনিবেশিক শিক্ষাদর্শন, একুশে২৪ অনলাইন।

রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুর (১৯৯৯), সামাজিক ইতিহাস ও উন্নয়ন ভাবনা, ৩৮/২/ক, বাংলাবাজার, ঢাকা।

রহমান, আজিজুর (২০১৫), কৃষি ব্যাংকের প্রভাব; অর্থমন্ত্রীর অসন্তোষ, প্রথম আলো।

রহমান, আতিউর (২০০৯), শেখ মুজিবঃ বাংলাদেশের আরেক নাম, দিপ্তী প্রকাশনী, ৩৮/২খ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

রহমান, আতিউর (২০০৭), রবীন্দ্রনাথের গ্রামীণ উন্নয়ন ভাবনা, সমুন্নয়, ২/ই/১-বি, ময়মনসিংহ রোড, ঢাকা।

রেজা, মাহবুব (২০১৫), রবীন্দ্রনাথ, পদ্মা আমার প্রেয়সী, ৮ মে, জনকণ্ঠ।

শাকুর, আবদুশ (২০১১), রবীন্দ্রনাথের গ্রাম ও পরিবেশ ভাবনা, বিডি নিউজ২৪।

শাকুর, আব্দুশ (২০০৬), সমাজবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ, ৩ আগস্ট, দৈনিক যুগান্তর।

সিরাজ, শাইখ (২০১৩) রবীন্দ্রনাথের কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন ভাবনা, বাংলাদেশ প্রতিদিন।

হাই, হাসনাত আব্দুল (২০১২), গ্রামোন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।